

## পরিচ্ছেদ ৪৬

### ভাব-সম্প্রসারণ

কোনো কবিতা বা গদ্যরচনার অংশকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করাকে ভাব-সম্প্রসারণ বলে। কবিতার বেলায় সেইসব পঙ্ক্তির ভাব-সম্প্রসারণ দরকার হয়, যেগুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য বা তত্ত্ব থাকে। অন্যদিকে গদ্যরচনার সেইসব বাক্য ভাব-সম্প্রসারণের জন্য ঠিক করা হয়, সাধারণত যা প্রবাদ বা প্রবচনের মর্যাদায় উন্নীত। ভাব-সম্প্রসারণ করার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা যেতে পারে:

- ক. ভাব-সম্প্রসারণকে প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়: প্রথম অংশে ভাবের অর্থ, দ্বিতীয় অংশে ভাবের ব্যাখ্যা এবং তৃতীয় অংশে ভাবের তাৎপর্য।
- খ. ভাব-সম্প্রসারণের এই অংশগুলোকে আলাদা তিনটি অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা যায়।
- গ. ভাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুক্তি দেখাতে হয়, উদাহরণ দিতে হয়, তুলনা করতে হয়।
- ঘ. ভাব-সম্প্রসারণের বাক্যগুলো যাতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার।
- ঙ. প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- চ. ভাব-সম্প্রসারণে আলাদা কোনো শিরোনামের দরকার হয় না।
- ছ. মূল ভাবটি রূপক বা প্রতীকের আড়ালে থাকলে তাকে স্পষ্ট করতে হয়।
- জ. ভাব-সম্প্রসারণ করার সময়ে প্রদত্ত অংশের রচয়িতার নাম উল্লেখ করতে হয় না।
- ঝ. কমবেশি ২০০ শব্দ অথবা অনধিক ২০টি বাক্যের মধ্যে ভাব-সম্প্রসারণ সীমিত থাকা উচিত।

নিচে ভাব-সম্প্রসারণের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হলো।

১.

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্যে

তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

ভাব-সম্প্রসারণ: যে অন্যায় করে এবং যে সেই অন্যায় সহ্য করে, তারা উভয়ে সমান অপরাধী – উভয়ে সমান ঘৃণার পাত্র।

আইনের দৃষ্টিতে অন্যায়কারীকে অপরাধী মনে করা হয়। তাই তার জন্য শাস্তির বিধান থাকে। আবার অনেক মানুষ আছে তারা সরাসরি অন্যায় করে না, কিন্তু পেছনে থেকে অন্যায়কারীকে সহায়তা করে বা অন্যায় করতে উৎসাহিত করে। আইনের আওতায় এরাও কখনো কখনো অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়। আবার, এমনও লোক থাকে – যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যায় করে না, অন্যায় ঘটার সময়ে শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। আইনের চোখে তাদের অপরাধী বলা যায় না। আইনের চোখে অপরাধী না হলেও এই নীরব দর্শকেরাও এক অর্থে অন্যায় ঘটাতে সহযোগিতা করে। কেননা, অন্যায় সংঘটিত হওয়ার সময়ে ওইসব দর্শক যদি সরব প্রতিবাদীর ভূমিকা পালন করত, তাহলে অন্যায় ঘটত না। আইনের চোখে এরা হয়তো অপরাধী নয়, কিন্তু বিবেকের দায় থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া যায় না। সমাজ থেকে অন্যায়কে দূর করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিবেকের দায়সম্পন্ন সচেতন মানুষের উপস্থিতিও জরুরি, যারা অন্যায়ের প্রতিবাদে সব সময়ে সোচ্চার হবে, সরব হবে। অপরাধী যাতে অপরাধ করার সুযোগ না পায়, সবাইকে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

অন্যায়কারীকে যথাযথভাবে শাস্তি দিলে অন্যায় প্রশ্রয় পায় না। আবার অন্যায় করতে না দিলে অন্যায়ের ঘটনা ঘটে না। তাতে সমাজ থেকে অন্যায় চিরতরে দূর হয়। তাই অন্যায়কারী এবং অন্যায়-সহকারী উভয়ই সমাজে নিন্দনীয়।

২.

আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে।

ভাব-সম্প্রসারণ: ব্যক্তির জীবনাচরণের মধ্যে যা নেই, তা অন্যকে উপদেশ আকারে দেওয়া যায় না। অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে তা পালন করে দেখাতে হয়। এর ফলে যাকে উপদেশ দেওয়া হয়, সে তা পালন করতে আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়।

কাউকে উপদেশ দেওয়া যত সহজ, উপদেশ পালন করা তার চেয়ে অনেক কঠিন। যে উপদেশ দেয়, সে যদি নিজে তা পালন না করে, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে এর গুরুত্ব থাকে না। অন্যদিকে উপদেশ দানকারী যদি সেই উপদেশের পালনীয় দিক নিজ জীবনে পালন করে দেখান, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশ পালনের দৃষ্টান্ত পেয়ে যান, যা তার জীবনাচরণে সক্রিয় প্রভাব ফেলে। সাধারণত ধর্মপ্রবর্তক, ধর্মপ্রচারক, জ্ঞানী ব্যক্তি বা জীবনে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তদের তরফ থেকে উপদেশ-বাণী বর্ষিত হয়ে থাকে। এঁদের দেওয়া উপদেশ মানুষ পালন করতে দ্বিধা করে না। তবে উপদেশ হিসেবে বর্ষিত কথাটুকু তাঁরা নিজেদের জীবনেও অনুসরণ করেন কি-না – এ বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক থাকতে হয়। সমাজে অনেক মানুষ থাকে, যারা উপদেশ দিতে খুব পটু, কিন্তু ওইসব উপদেশ তারা নিজেরাই পালন করতে অভ্যস্ত নয়। তখন উপদেশগুলো উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে সেইভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একজন লোক নিয়মিত ধূমপান করে, আবার সে যদি অন্যকে ধূমপান করতে নিষেধ করে, তাহলে তা হাস্যকর উপদেশে পরিণত হয়। তাই কোনো একটা ভালো কাজ করতে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার আগে উপদেশদাতাকেই ভালো কাজটি করতে অভ্যস্ত হতে হবে। তাতে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশের পাশাপাশি উপদেশ পালনের নজিরও গ্রহণ করতে পারে।

কাউকে উপদেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে ভালো মানুষ সাজার ভান করা খুব সহজ, কিন্তু উপদেশ পালন করা খুব কঠিন কাজ। তবে সেই উপদেশদাতাই সর্বোত্তম, যিনি নিজে যা পালন করেন, অন্যকেও তা পালন করতে বলেন।

৩.

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;  
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

ভাব-সম্প্রসারণ: ক্ষুধার্ত মানুষের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষুধা নিবৃত্তি। সব কিছুর মধ্যেই সে ক্ষুধা নিবৃত্তির কথা ভাবে। তখন কোনো কিছু সুন্দর কি অসুন্দর, তা তাকে ভাবায় না।

প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কতগুলো মৌলিক চাহিদা রয়েছে। খাদ্য হলো এর মধ্যে প্রধান মৌলিক চাহিদা। খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের শরীরে তৈরি হওয়া এই খাদ্যের চাহিদারই অপর নাম ক্ষুধা। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। মানুষ যে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, তার পেছনে এই ক্ষুধা নিবৃত্তিই মূল চালিকাশক্তি। ক্ষুধা নিবৃত্তি হওয়ার পরেই মানুষ অন্যান্য মৌলিক চাহিদার কথা ভাবে। বাসস্থানের কথা ভাবে, পোশাকের কথা ভাবে, স্বাস্থ্যের কথা ভাবে। সুন্দর-অসুন্দরের কথা ভাবে একেবারে শেষ পর্যায়। তাই ক্ষুধা যখন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সৌন্দর্যের মূল্য তার কাছে থাকে না। একজন সুখী মানুষের কাছে পৃথিবীকে সুন্দর মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে তা নাও হতে পারে। অতীতে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যেত। সামান্য দুটো রুটির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে সারাদিন পরিশ্রম করতে হতো। সেই দুর্ভিক্ষে একজন শ্রমজীবীর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ বড়ো জোর একখানা ঝলসানো রুটির মতো মনে হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পৃথিবীর সৌন্দর্য কোনো তাৎপর্য বহন করে না। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তার সবচেয়ে আগে দরকার খাদ্য। গদ্যের কাঠিন্যটুকু সে ভালো উপলব্ধি করতে পারে; কাব্যের কোমলতা তার কাছে অর্থহীন।

## ৪.

গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন,  
নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন।

ভাব-সম্প্রসারণ: ধন-সম্পদ যদি নিজের নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তবে দরকারের সময়ে তা কোনো কাজে আসে না। একইভাবে জ্ঞান যদি শুধু বইয়ের পাতায় আটকে থাকে, সে-বিদ্যা ব্যক্তি তার নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারে না।

মানুষের অভিজ্ঞতা ও প্রমাণ-লব্ধ জ্ঞান বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। বই পাঠ করলে পৃথিবীর সব ধরনের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। কেউ যদি নিয়মিত বই পড়ে তাহলে সে ধীরে ধীরে নিজেকে জ্ঞানী করে তুলতে পারবে। বই থেকে অর্জিত এই জ্ঞান দিয়ে সে নিজের বা অন্যের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। বই থেকে আহরিত জ্ঞান থেকে সে নিজে যেমন আলোকিত হতে পারে, অন্যকেও আলোকিত করতে পারে। কিন্তু জ্ঞান যদি বইয়ের মাধ্যমেই শুধু আবদ্ধ থাকে, তাহলে তা কারো কোনো কাজে আসে না। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে হাজার হাজার বই কিনলেন আর তা দিয়ে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করলেন। লাইব্রেরির তাকে তাকে বইগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলেন। কিন্তু জ্ঞানের কোনো বিষয়ে কেউ যদি তাঁকে প্রশ্ন করে, তিনি তার যথাযোগ্য জবাব দিতে ব্যর্থ হবেন। আবার বইয়ের বিদ্যা না বুঝে কেবল ঠোঁটস্থ বা মুখস্থ করলেই হবে না। এই বিদ্যার প্রায়োগিক দিকটিও উপলব্ধি করতে হবে। অনেকটা জায়গা-জমি বা অর্থের



মতো। নিজের সম্পদ-সম্পত্তি অন্যের হাতে থাকলে তা ভোগ করা যায় না। অন্যের কাছে থাকা অর্থ আর বইয়ের পাতার সীমাবদ্ধ জ্ঞান এভাবে সমার্থক হয়ে যায়।

বইকে শুধু পরীক্ষা পাশের উপকরণ মনে করলে চলবে না। বইয়ের জ্ঞানকে জীবনে কাজে লাগাতে পারলে তবেই সার্থকতা।

৫.

জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো।

ভাব-সম্প্রসারণ: কর্মের দ্বারাই মানুষ পৃথিবীর বুকে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পায়। কোনো মানুষের জন্ম যে বংশেই হোক না কেন, কাজই তার পরিচয় নির্ধারণ করে।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। তখন পিছনে পড়ে থাকে তার ভালো-মন্দ সব ধরনের কাজ। কাজ ভালো হলে বহু কাল যাবৎ মানুষ তা মনে রাখে। আর কাজ খারাপ হলে যুগ যুগ ধরে সকলে তার নিন্দা করে। বংশমর্যাদার উপরে এইসব সুনাম বা দুর্নাম নির্ভর করে না। বংশে কেউ একজন সুনাম করলে সেই বংশের মর্যাদা বাড়ে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, এই মর্যাদা চিরস্থায়ী। কেননা, একই বংশে কোনো কুলাঙ্গার জন্ম নিলে সেই মর্যাদা ভুলুপ্তি হতে পারে। আবার, অনেকে খুব সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়েও নিজ নিজ কৃতিত্বের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, আবার কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন দরিদ্র পরিবারে। এ দুজন ব্যক্তি বংশ পরিচয়ে নয়, বরং কর্ম দ্বারা মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছেন।

মানুষের পরিচয় কখনোই তার বংশ বা পরিবারের মর্যাদা-অমর্যাদার উপর নির্ভর করে না – নির্ভর করে তার নিজ নিজ কর্ম ও সুকৃতির উপর। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, মানবসেবা – পছন্দসই যে কোনো ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে উৎসর্গ করে অমর হতে পারে।

৬.

দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

ভাব-সম্প্রসারণ: দুর্জন মানে খারাপ লোক। খারাপ লোক যতই শিক্ষিত হোক না কেন, তার সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।

সাধারণত মিথ্যাবাদী, দুর্নীতিপরায়ণ ও চরিত্রহীন লোককে এককথায় দুর্জন বলা হয়। যারা খারাপ লোক, তাদের কথায় ও আচরণে খারাপ স্বভাব প্রকাশ পায়। খারাপ লোক শিক্ষিত হতে পারে, উচ্চশিক্ষিত হতে পারে; আবার নিরক্ষরও হতে পারে। অর্থাৎ কারো খারাপ হওয়ার সঙ্গে শিক্ষিত হওয়া বা না-হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। যারা খারাপ লোকের সঙ্গে মেশে, তাদের সবাই খারাপ লোক মনে করে। এজন্য খারাপ লোকের সঙ্গে ত্যাগ করতে হয় এবং তেমন লোকের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়। একসময়ে এই বিশ্বাস করা হতো – কোনো কোনো বিষধর সাপের মাথায় মণি আছে। কিন্তু মণি আছে বলে সাপের সঙ্গে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তেমনি দুর্জন লোক শিক্ষিত হলেও তার সঙ্গে পরিত্যাগ করা উচিত। দুর্জন লোক অপরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কখনো পায় না। তার কাছ থেকে সঙ্গীর কিছু শেখার নেই। এমনকি, দুর্জনের কারণে সঙ্গীর বিপদও হতে পারে। বিপরীতভাবে, ভালো লোক নিরক্ষর হলেও তার সঙ্গে প্রীতিকর হয়। ভালো লোকের কাছ থেকে তার সঙ্গীর বিপদ ঘটানো সম্ভাবনা থাকে না।

সচ্চরিত্র গঠন করা বিদ্যা অর্জন করার চেয়েও কঠিন কাজ। তাই যিনি চরিত্রবান, তার বিদ্যা থাক বা না-থাক, তার সঙ্গে প্রত্যাশিত। অন্যদিকে চরিত্রহীন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা ক্ষতিকর।

## ৭.

প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

ভাব-সম্প্রসারণ: খাদ্য গ্রহণ করে, শারীরিকভাবে বাড়ে আর বংশ বৃদ্ধি করে – মোটামুটি এসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো কিছুর প্রাণ আছে বলে মনে করা হয়। মানুষেরও প্রাণ আছে, কিন্তু মানুষের থাকে এর অতিরিক্ত আর একটি সত্তা, তা হলো মন।

মানুষকে বলা হয় সৃষ্টির সেরা জীব – সেরা প্রাণী। মূল কারণ তার মন আছে। এই মনের মাধ্যমে মানুষ তার চারপাশের জগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। তার মধ্যে ভালো-মন্দের ধারণা সৃষ্টি করে, নৈতিকতার জন্ম দেয়। এমনকি এই মন দিয়ে সে গড়ে তোলে তার নিজস্ব সংস্কৃতি। এই সাংস্কৃতিক বোধ থেকে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদান। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে এইসব উপাদান থাকে না। ইতর প্রাণীর মন থাকে না বলে তার সংস্কৃতি নেই, তার ভালো-মন্দের বোধ নেই, তার নৈতিকতার বালাই নেই। মানুষের মন এভাবে অন্যান্য প্রাণী থেকে তাকে আলাদা করে। মনকে আবার অনেক সময়ে ভালো কিছুর কেন্দ্র হিসেবেও ভাবা হয়। যেমন, যখন কোনো ব্যক্তির দানশীলতার কথা বলা হয়, তখন বলা হয়, তাঁর মন আছে। আবার কোনো লোককে যখন চরম স্বার্থপর ও কৃপণ হিসেবে চিত্রিত করার দরকার হয়, তখন বলা হয়, লোকটার মন ছোটো। এদিক দিয়ে মন হলো মানুষের ভালো-মন্দ পরিমাপের এক ধরনের মাপকাঠি।

মানুষের মন আছে বলেই সে মানবিক গুণের অধিকারী। আর যার মন নেই, অবশ্যই সে ইতর প্রাণীর সঙ্গে তুলনীয়। সেই ইতর প্রাণী হতে পারে চরমভাবে হিংস্র অথবা একান্তই গোবেচারী কোনো পশু, পাখি বা মাছ।

৮.

বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।

ভাব-সম্প্রসারণ: জ্ঞান আহরণ করার আশা নিয়ে মানুষ বই কেনে। আর এই বই কেনার জন্য যে অর্থ-ব্যয় হয়, অর্জিত জ্ঞানের তুলনায় তা খুব নগণ্য।

বই মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়ে মনের জগৎকে প্রসারিত করে। কৃপমণ্ডকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের সূচনায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দার্শনিকগণ বলেছিলেন, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। তাঁদের ধারণা অনুযায়ী জ্ঞানের সীমানা বাড়তে, বুদ্ধিকে বন্ধনহীন করতে, আর মানুষের মুক্তি আনতে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। সব মানুষই খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করে। মৌলিক চাহিদা পূরণের পর অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করার আরো অনেক উপায় আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো উপায় – বই কেনা। বই কিনে কেউ নিঃস্থ হয় না। কারণ, একটা বইয়ের অর্থমূল্য বেশি নয়। বরং একটি বই কিনতে যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ অনেকে অন্যান্য কাজে ব্যয় করে থাকে। ব্যক্তিকে আলোকিত করতে একটি বই যেভাবে ভূমিকা রাখে, তাতে বই কেনার ব্যাপারে কার্পণ্য করা বোকামি। একটা বই অনেক সময়ে মানুষের জীবনকে পর্যন্ত বদলে দিতে পারে।

বই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। তাই নিজেকে সমৃদ্ধ করতে বই কেনার ও তা পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

৯.

বার্ধক্য তাহাই – যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

ভাব-সম্প্রসারণ: কেবল বয়সের মাপকাঠিতে তারুণ্য বা বার্ধক্যকে বিচার করা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও কর্মস্পৃহার তারতম্য মানুষকে তরুণ ও বৃদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে।

মানুষ শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। এ বার্ধক্য ব্যক্তির নানা ধরনের শারীরিক সক্ষমতা হ্রাস করতে পারে ঠিকই, কিন্তু সবাইকে মানসিকভাবে জরাগ্রস্ত করতে পারে না। এদের কর্মশক্তি ও মানসিক-শক্তি অনেক তরুণকে হার মানায়। পক্ষান্তরে, এমন অনেক তরুণ রয়েছে – যারা নতুনকে গ্রহণ করতে পারে না, অন্ধবিশ্বাস ও গতানুগতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, সত্যকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়। তারা আসলে তারুণ্যের খোলসে বার্ধক্যকে লালন করে। আর যেসব বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়, ইতিবাচক ভাবনায় জীবনকে পরিচালিত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে তারুণ্যের অমিতশক্তি ধারণ করে। তরুণরা সব সময়ে আলোর পথের যাত্রী। কঠিন সত্যকে মেনে নিয়ে তারা নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারে। যুক্তির আলোয় কুসংস্কারকে বাতিল করে তারা প্রতিষ্ঠা করে নতুন সত্য। তারা ধ্বংস ও মৃত্যুকে পিছনে ফেলে সৃষ্টির আনন্দে এগিয়ে যায়। তারুণ্যের এই বোধ ও অনুভূতি যে কোনো বয়সের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে। প্রকৃত বৃদ্ধ তারা, যারা তারুণ্যের দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিতে চায় না, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনকে অস্বীকার করে, নতুন সূর্যের আলোয় অস্বস্তিবোধ করে। তারা তারুণ্যের অগ্রযাত্রায় অংশ নেওয়ার পরিবর্তে বিয় সৃষ্টি করে।

বার্ধক্যের পরিচয় বয়সে নয়, পশ্চাদ্ধুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে।



১০.

বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।

**ভাব-সম্প্রসারণ:** বিদ্যা মানুষের জীবনকে উন্নত করে। তাই বিদ্যা অর্জন অত্যাবশ্যক। তবে যে বিদ্যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনো সংযোগ নেই, সে বিদ্যা অকার্যকর।

মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিদ্যাচর্চা করতে হয়। প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তি জীবনকে মহীয়ান করে গড়ে তোলেন। তিনি নিজে যেমন আলোকিত হন, তেমনি আলোকিত করেন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে। অপরদিকে বিদ্যাহীন মানুষ সমাজের বোঝাম্বরূপ। সে অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে থাকে। একমাত্র বিদ্যাই পারে সেই অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে তাকে মুক্ত করতে। একজন প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ জীবনের বাস্তবতাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে। বিদ্যা তাকে জ্ঞানী করে, বিদ্যাই তার চিন্তা-ভাবনা ও আচার-ব্যবহারকে পরিশীলিত করে। এমনকি সংস্কৃতিবান ও উদার দৃষ্টির মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতেও বিদ্যার কোনো বিকল্প নেই। তবে কিছু বিদ্যা মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এসব বিদ্যা অর্জন করা অর্থহীন। মুখস্থ বিদ্যা আর গ্রন্থগত বিদ্যা মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কোনো কাজে আসে না। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখায় না, কুসংস্কারের বেড়া জাল থেকে মুক্ত করে দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার করে না, এমনকি জীবনকে এগিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে পিছিয়ে দেয়। এমন বিদ্যা অবশ্যই কাজিফত নয়।

প্রকৃত শিক্ষা জীবনের সব দিককে আলোকিত করে। সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয় ব্যক্তি ও সমাজ। অন্যদিকে যে বিদ্যা জীবনকে ইতিবাচক পথে চালিত করতে পারে না, সে বিদ্যা মূল্যহীন।

১১.

মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।

**ভাব-সম্প্রসারণ:** দীর্ঘ জীবন নয়, বরং মহৎ কর্মের মধ্যে মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত। কর্মগুণে মানুষ অন্যের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়।

মানুষ অনন্তকাল বেঁচে থাকে না। একেক মানুষ একেক রকম আয়ু ভোগ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। এমন অনেক মানুষ আছে, যারা দীর্ঘকাল পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্যদের কাছে বিস্মৃত হয়ে যায়। কারণ, তাদের জীবন বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে উল্লেখ করার মতো হয় না। জীবদ্দশায় তারা এমন কোনো কাজ করে যেতে পারে না, যার কারণে মানুষ তাদের স্মরণ করবে। তাই দীর্ঘায়ুর অধিকারী হয়েও সেসব ব্যক্তি জীবনকে গৌরবান্বিত করতে পারে না। পক্ষান্তরে এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা স্বল্প আয়ুর জীবনে নিজেকে অরণীয় করে গেছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁদের নাম উচ্চারিত হয়। পৃথিবীতে মহৎ হৃদয়ের মানুষ

মানবতার কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেন, দেশ ও জাতির স্বার্থে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। একুশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে গভীর জীবনবোধ ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য অরণীয় হয়ে আছেন। ভাষা আন্দোলনে যারা শহিদ হয়েছেন, সেই রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার, তাঁরা সকলেই ছিলেন বয়সের দিক দিয়ে একেবারে তরুণ। অর্থাৎ অরণীয়-বরণীয় হওয়ার জন্য বয়স গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জীবনটা বেশি দিনের কি কম দিনের, সেটা মোটেই বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য হলো মহৎ কর্ম করে বেঁচে থাকা। মহৎ কর্মের মাধ্যমে যারা জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারেন, প্রকৃত অর্থে তাঁরাই দীর্ঘজীবী বা চিরজীবী।

১২.

মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে,

হারা শশীর হারা হাসি, অন্ধকারেই ফিরে আসে।

ভাব-সম্প্রসারণ: মানুষের জীবনে সুখ বা দুঃখ চিরস্থায়ী নয়। সুখের পরে দুঃখ আসে, আবার দুঃখের পরে সুখ আসে। এজন্য সুখে যেমন অতিরিক্ত আত্মহারা হতে নেই, তেমনি বিপদেও ধৈর্যহারা হওয়া ঠিক নয়।

আকাশ যখন মেঘে আচ্ছন্ন হয়, সূর্য বা চাঁদের আলো তখন ঠিকমতো পৃথিবীতে পৌঁছায় না। ফলে দিনের বেলায় সূর্য দেখা যায় না, রাতের বেলায় চাঁদ দেখা যায় না। কিন্তু এমন ঘটনা খুবই সাময়িক। দিনের অধিকাংশ সময়ে সূর্য দেখা যায়। একইভাবে মেঘও চাঁদকে বেশিক্ষণ আড়াল করে রাখতে পারে না। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের হাসি তাই সবারই দেখার সুযোগ হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে মেঘের আড়াল যেমন সত্য, মেঘহীন আকাশও সত্য। একইভাবে মানুষের জীবনেও কখনো কখনো দুঃখ-দুর্দশার কালো মেঘ হাজির হয়। মনে হয়, এই দুর্দশা যেন আর কাটবে না। দুর্বলচিত্তের মানুষ তখন দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা ভুলে যায়, মানুষের জীবনে কোনো কিছুই নিরবচ্ছিন্ন নয়। জীবন-আকাশের এই কালো মেঘও বাস্তব মেঘের মতো সাময়িক। এজন্য বিপদে ভেঙে না পড়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তা মোকাবিলা করতে হয়।

মানুষের জীবনে কোনো দুঃসময়ই চিরস্থায়ী বা অনিবার্য নয়। ধৈর্য ধরে দুঃসময়কে অতিক্রম করতে পারলেই সুখ-সূর্য বা সুখ-চাঁদের দেখা মেলে। জীবন তখন পুনরায় সুন্দর ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

১৩.

ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ।

ভাব-সম্প্রসারণ: ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভোগের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় ব্যক্তির লোভ-লালসা। তাই ভোগ নয়, ত্যাগের চর্চাই মানুষের সুন্দর গুণাবলিকে উৎকর্ষ দান করে।



ভোগ ও ত্যাগ দুটি বিপরীত বিষয়। মানুষ ইন্দ্রিয় সুখের আশায় ভোগে মগ্ন হয়; অন্যদিকে মানসিক তৃপ্তির আশায় ত্যাগ স্বীকার করে। ভোগ সাময়িক সুখ আনতে পারে। তবে যিনি ত্যাগে কুণ্ঠিত হন না, তিনি অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। ভোগের নিমিত্তে মানুষ জড়িয়ে যায় পঙ্খিলতায় – হিংসা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা ও ঘেঁষাচারিতাকে আপন করে নেয়। ভোগবাদী মানুষ তাদের সম্পদ কখনো পরার্থে ব্যয় করে না, পরের দুঃখে কাতর হয় না; বরং হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সুযোগের সন্ধান করে। মানবিকতা ও পরার্থপরতা তাদের কাছে অর্থহীন। তাই সমাজের মানুষের কাছেও তাদের কোনো মর্যাদা থাকে না। তারা জন্মগতভাবে মানুষ হলেও তাদের মনুষ্যত্ব আসলে বিকশিত হয় না। আবার কিছু মানুষ ভোগের চেয়ে ত্যাগকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মানুষের বিপদে তাঁরা ছুটে যান, নিজের সুবিধার কথা না ভেবে বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভাবেন, দুঃখীজনের দুঃখ দূর করতে নিজের সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পান। ভোগবাদী মানুষের ভ্রান্ত ধারণা – ভোগের মধ্যেই সকল সুখ। তাই তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে বিলাস-বাসনে মগ্ন হয়। তারা ভোগের মাধ্যমে সুখী হতে চায় বটে, তবে তারা প্রকৃত সুখের সন্ধান পায় না। বরং যেসব মানুষ নির্বিধায় অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন, তাঁদের দ্বারা সমাজ যেমন উপকৃত হয়, তাঁরা নিজেরাও এসব কাজের মধ্য দিয়ে অনাবিল আনন্দ লাভ করেন।

ত্যাগের মহীমা অসীম। মনুষ্যত্ব বিকাশে ত্যাগের চর্চার কোনো বিকল্প নেই। ভোগ মনুষ্যত্বকে লজ্জা ও হীনতায় ডুবিয়ে রাখে।

১৪.

যে নদী হারায় স্রোত চলিতে না পারে  
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে;  
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়  
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

ভাব-সম্প্রসারণ: গতিশীলতা প্রাণের ধর্ম। যেখানে গতি নেই, চঞ্চলতা নেই, সেখানে স্থবিরতা জেঁকে বসে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় – সকল ক্ষেত্রেই স্থবিরতা যাবতীয় অর্জন ধ্বংস করে দেয়। তাই কৃতিত্ব, সাফল্য ও সমৃদ্ধির জন্য গতিশীলতার কোনো বিকল্প নেই।

নদীর ধর্ম বয়ে চলা। স্রোতই তার গৌরব। স্রোত না থাকলে নদী ধীরে ধীরে মরে যায়। স্রোতের টানে বিশাল জলরাশি পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে ধেয়ে চলে। এই স্রোতই নদীকে প্রাণের স্পন্দনে জাগিয়ে রাখে, দুই পাড়ে জন্ম দেয় নতুন নতুন সভ্যতার। তার গতিচাপল্যে ফুটে ওঠে জীবনের বলিষ্ঠ প্রকাশ। সব জঞ্জাল ভাসিয়ে নিয়ে সব রকমের পঙ্খিলতা থেকে নদীকে মুক্ত রাখে স্রোত। তবে কখনো যদি এই স্রোত থেমে যায়, রুদ্ধ হয় কোনো গতির সীমায়, তবে নদী তার গৌরব হারায়। নদীর বুকে জন্ম নেয় অসংখ্য জলজ উদ্ভিদ, আবর্জনায় ঢেকে যায় টলমলে জলের ধারা। গতিচাপল্য, ছন্দময়তা আর জলকল্লোল হারিয়ে নদীটি নির্জীব

হয়ে পড়ে। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি নদীর মতো - গতিময়তায় তার প্রাণ; গতিহীনতায় তার মৃত্যু। আধুনিকতা, উন্নয়ন, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি - প্রতিটি ধারণার সঙ্গে উদ্যম, গতিময়তা ও পরিবর্তনশীলতার যোগ রয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা সমাজ যদি প্রাচীনতাকে আঁকড়ে ধরে নতুন সময়ে টিকে থাকতে চায়, তবে ওই ব্যক্তি বা সমাজ নতুন সময়ের দাবিকে উপেক্ষা করল। অযৌক্তিক বিশ্বাস, মিথ্যা ও সংকীর্ণ সংস্কার আর অচল ভাবনার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে যে জাতি পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারে না, তারা স্রোতহীন নদীর মতো স্থবির হয়ে পড়ে। তাতে যুক্ত হয় মিথ্যা সংস্কারের নতুন নতুন জঞ্জাল। রুদ্ধ হয় সম্ভাবনার সকল দ্বার। আর যে জাতি একটি স্বাভাবিক চলনধর্ম মেনে নতুনকে স্বাগত জানায়, নিঃসঙ্কোচে আলিঙ্গন করে নতুন সভ্যতাকে, সংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করে নতুন জ্ঞানকে গ্রহণ করে, সে জাতিকে কখনো স্থবিরতা পেয়ে বসে না।

পরিবর্তন আর অগ্রগতির প্রধান শর্ত গতিশীলতা। সবকিছু স্থবির থাকলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার এতখানি অগ্রসরতা ঘটতো না।

১৫.

যে সহে, সে রহে।

ভাব-সম্প্রসারণ: এ সংসারে দুঃসময়ে যে ধৈর্য ধরে, ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সুসময়ের অপেক্ষা করে, সে কখনো পরাজিত হয় না। ধৈর্যশীলরাই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়।

পৃথিবীতে জীবন একদিকে যেমন পরম উপভোগ্য, অন্যদিকে পরাজয়, লাঞ্ছনা, হতাশা ও দুর্দশার কশাঘাতে জর্জরিত। রোগ-শোক ও অভাব-অভিযোগ সংসারের নিত্যদিনের চিত্র। তাই পীড়িত মানুষ যন্ত্রণায় অসহায়বোধ করে, আঘাতে-অপমানে জর্জরিত হয়, পরাজয়ের গ্লানিতে নিমগ্ন হয়ে হতাশায় মুগ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না। খারাপ সময়কে মোকাবেলা করতে হবে। জীবনে পরাজয় থাকে। সে পরাজয় মেনে নিয়ে পরবর্তী যুদ্ধজয়ের সংকল্পে ব্রতী হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এজন্য দরকার অটল ধৈর্য, স্থির সংকল্প এবং যথাযথ পরিকল্পনা। এমন কিছু আঘাত আছে, যার বিপরীতে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে ধৈর্য ধরলেই ভালো ফল পাওয়া যায়। কারণ, সময় সবচেয়ে বড়ো চিকিৎসক। নিজের করা ভুলেও সব পরিকল্পনা ভেঙে যেতে পারে, অযোগ্যতার দায়ে ভোগ করতে হতে পারে কঠিন দণ্ড। তখন ভেঙে না পড়ে ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে সবকিছু শুরু করতে হবে। তাহলেই মোচন করা সম্ভব হবে পূর্বের গ্লানি। বিপদে অসহায়ত্বকে বরণ করে হাত-পা গুটিয়ে থাকার মধ্যে নয়, তাকে মোকাবিলা করার মধ্যেই মানুষের সংগ্রামশীলতার পরিচয়।

জীবনে যত প্রতিকূলতাই আসুক না কেন, তাকে ধৈর্যের সঙ্গে ইতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে মোকাবেলা করতে হয়। কারণ, জীবনে দুঃসময় না এলে লড়াই করা শেখা যায় না।